



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 558 - 564

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

‘ট্রেন টু পাকিস্তান’ ও ‘পেশোয়ার এক্সপ্রেস’ : মুহাজির ও শরণার্থীদের অমঙ্গল যাত্রার আলেখ্য

আব্দুল সামাদ

প্রাক্তন গবেষক, বাংলা বিভাগ

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: asjrm2014@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Diverse India,
Past heritage,
Imperialism,
Communalism,
Mountbatten
Plan, Radcliffe
Line, Riots,
Genocide.

Abstract

An unprecedented and unparalleled chapter in world history is the partition of India in 1947. A single country was divided to create two separate nation-states named India and Pakistan. Especially, during the partition, the naked reality of religion-based communalism severely impacted the lives and families of ordinary people. However, the partition deeply shocked the common people. Especially as a result of this division, countless people from the Hindu, Muslim, and Sikh communities in affected provinces of Punjab and Bengal were severely affected in their lives and families. The children, young, and the elderly people were killed. Numerous women lost their honour. Thousands of people lost their property due to looting and acquisition. Countless people were lost their domestic animal. The path became muddy with blood. Many of those who were forced to leave their homeland for religious reasons could not find safe haven—because many people died on the way while walking, traveling by a car, or by train. Many people lost everything on the roads. Many people lost their relatives forever. The mutual brotherhood among human neighbours turned into enmity. And a unique chapter of art, literature, and history was created around that tragic and tragic event in the social and political history of India. Two notable creations in this genre are ‘Train to Pakistan’ and ‘Peshawar Express’, which display the pathos and agony of a fragmented Punjab divided by the Radcliffe Line.

Discussion

১৯৪৭ সালের পূর্বে যারা ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম যত্রতত্র পরিভ্রমণ করে বেড়াত তারা ভারতীয় নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্টের পর একশ্রেণির মানুষ পরিচিত হয় পাকিস্তানি নামে এবং অন্য আরেক একশ্রেণির মানুষের পরিচয় হয় ভারতীয় নামে। কারণ ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট ব্রিটিশদের পরিকল্পনা, চক্রান্ত ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের কারুকার্য দ্বারা খচিত হয় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি পৃথক জাতিসত্তার দেশ। ধর্মকে পাথেয় করে

যেমন দুটি দেশের জন্ম হয় তেমনি ধর্মকে আঁকড়ে ধরার জন্য সাতপুরুষের জন্মভিটে পরিত্যাগ করে মানুষ স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়। ফলে ভারত থেকে যে সমস্ত মানুষ পাকিস্তানের অভিমুখে রওনা দেয় তারা পরিচিত হয় ‘মুহাজির’ নামে এবং পাকিস্তান থেকে যে সমস্ত মানুষ ভারত অভিমুখে পাড়ি দেয় তারা পরিচিত হয় ‘শরণার্থী’ নামে। কিন্তু উভয় শ্রেণিই হল উন্মূল, উদ্‌বাস্ত, ভিটেমাটি হারা মানুষ। তারা কেউই আশ্রয়ের সন্ধান পুরোপুরি অনির্দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেনি— তারা যাত্রা করেছিল নির্দেশিত স্বপ্নভূমি ভারত ও পাকিস্তান নামে সৃষ্ট ঘৃণ্য রাজনৈতিক কারুণ্যময় দেশে। তবে তাদের যাত্রা স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার ছিল না— ছিল বাধ্যবাধকতার। তাই তাদের সেদিনের যাত্রা শুভ হয়নি। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কেবল পাঞ্জাব, কাশ্মীর, অসম ও বঙ্গদেশের মানুষই ঐ অমঙ্গল যাত্রায় পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছিল। আর সেই অমঙ্গল যাত্রার করুণ বংশধরিনি আমরা শুনতে পাই বাংলা, উর্দু, পাঞ্জাবি, ইংরেজি প্রভৃতি ভাষার সাহিত্যে। বিশেষ করে পাঞ্জাব প্রদেশের হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের অমঙ্গল যাত্রার করুণ প্রতিচ্ছবি আমরা ‘ট্রেন টু পাকিস্তান’ ও ‘পেশোয়ার এক্সপ্রেস’ নামক উপন্যাস ও ছোটগল্পটিতে দেখতে পাই।

দেশবিভাগের সাহিত্য ধারার এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন খুবসন্ত সিং রচিত ‘ট্রেন টু পাকিস্তান’ উপন্যাসটি। মূল উপন্যাসটি ইংরেজি ভাষায় লেখা এবং প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। উপন্যাসটির বাংলা অনুবাদক আবু জাফর এবং অনূদিত উপন্যাসটি বাংলাদেশ থেকে ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির অন্তঃসার বয়ন করা হয়েছে চারটি পর্বে, যথা— ডাকাতি, কলিযুগ, মানো মাজরা ও কর্ম নামে। এই চার পর্বের উপন্যাসটির গর্ভগৃহে বিধৃত হয়েছে ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি, পাকিস্তান সৃষ্টি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস ইতিবৃত্ত। এই তিন ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে বেগবানভাবে ধাবিত হয়েছে প্রেম, সম্প্রীতি ও প্রতিশোধ স্পৃহা; যা উপন্যাসিক এক অনন্য সাধারণ দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন। তবে উপন্যাসিকের বাস্তব অভিজ্ঞতা জারিত এ কাহিনি কোনো কাল্পনিক গল্পের বিষয়বস্তু নয়— এ এক ইতিহাসের সাক্ষ্যদানকারী প্রামাণিক সামাজিক দলিল। উপন্যাসিক মানুষের সমাজ ও মনস্তত্ত্বের অতল গভীরে প্রবেশ করে সন্ধান করেছেন এক টুকরো মিলনঘন সহানুভূতির এবং জাতীয় সংহতির প্রেরণাসংজাত আত্মিক বোধের। কিন্তু কোথাও তিনি তা খুঁজে পাননি। তাই তিনি আক্ষেপের সুরে বলেছেন—

“আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা ম্যাজিস্ট্রেটদের দায়িত্ব। কিন্তু তাঁরা শৃঙ্খলা নিশ্চিত করেন তাঁদের পিছনে যে ক্ষমতা থাকে তার বলে, ঐ ক্ষমতার বিরোধিতা করে নয়। কিন্তু ক্ষমতা কোথায়? দিল্লীতে যেসব লোক আছে, তারা কি করছে? সংসদে তারা সুন্দর সুন্দর ভাষণ দিচ্ছে! লাউড স্পিকারে তাদের অহংবোধ জোরে প্রকাশ করছে। দর্শক গ্যালারীতে আকর্ষণীয় মহিলারা তাদের ভাষণের তারিফ করছে।”

শত্রুঘ্ন নদীর তীরে অবস্থিত মানো মাজরা ছোট্ট একটি গ্রাম। হিন্দু, মুসলমান, শিখ— সব মিলে সত্তরটি পরিবারের বসবাস। শান্তি ও সম্প্রীতির মিলন ক্ষেত্র। তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি ভিন্ন হলেও তারা কাজের জগতে একই সঙ্গে কাজ করে। সামাজিক ব্যবধান পরিহার করে মানবিক অনুভূমিক রেখার সমান্তরালে বাস করে। তাই মুসলমান যুবতী নূরান ও শিখ যুবক জুগুগাত সিং নির্ভয়ে প্রেমসম্পর্কে আবদ্ধ হতে পেরেছে। মহাজন লালা রামলালের হত্যা ও ডাকাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে মানো মাজরায় যে রহস্য উদ্‌ঘাটনের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তাতে আরো বেশি রহস্যের জন্ম দেয় পাকিস্তান থেকে আগত একটি ভূতুড়ে ট্রেন। কিন্তু কী ছিল ঐ ট্রেনে? আবার সেবিষয়ে মানুষের মনের সন্দেহের অবকাশ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। কারণ গ্রামবাসীদের মনে জাগ্রত সন্দেহ ও প্রশ্নচিহ্নের নিরসন হয় সেনাদের বাড়ি বাড়ি থেকে কেরোসিন ও লকড়ি সংগ্রহ দেখে এবং বাতাসে ভেসে আসা মৃতদেহ সংকারের দুর্গন্ধ থেকে। এরপর বর্ষা ও বন্যা মানো মাজরাকে প্লাবিত করে। কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের যে কালো মেঘ মানো মাজরার আকাশে ঘনীভূত হয়েছিল তা গ্রামবাসীদের মনেও প্রভাব ফেলে ছিল। প্রতিশোধ স্পৃহায় একদল শিখ যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। গুরুদুয়ারার বৈঠকে বসে এক ক্ষিপ্ত যুবক উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে—

“ওরা একজন হিন্দু বা একজন শিখকে মারলে তোমরা অপহরণ করবে দু’জনকে। প্রতিটি ঘর লুট করার বদলে তোমরা দুটো লুট করবে। একটা ট্রেন ভর্তি মৃতদেহের পরিবর্তে তোমরা পাঠাবে দুটো

ট্রেন ভর্তি মৃতদেহ। রাস্তায় একটা গাড়ি আক্রমণের শিকার হলে তোমরা আক্রমণ করবে দুটো গাড়ি। এ কাজ করলে সীমান্তের ওপারে হত্যা বন্ধ হবে। ওরা বুঝতে পারবে যে, আমরাও হত্যা ও লুটের খেলায় মেতেছি।”^২

তাই গণহত্যার আঁচ পেয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম চাঁদ বিলাসিতার মাঝে হঠাৎ সজাগ হয়ে ওঠে এবং হেড কনস্টেবলকে মানো মাজরা গ্রাম থেকে সব মুসলমানদের গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। আর মুসলমানদের ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির হেফাজতকারী করা হয় খুনি ও ডাকাত মাল্লিকে। কিন্তু মাল্লির লোকজন ও পাকিস্তান থেকে আগত উদ্ভাস্তরা মুসলমানদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি কুক্ষিগত করে ও ঘরবাড়িতে লুটপাট চালায়। অবশেষে তারা পরিকল্পনা করে যে ট্রেনটি মুসলমানদের নিয়ে রাতের অন্ধকারে পাকিস্তান রওনা দেবে তা আক্রমণ করে লাশ ভর্তি ট্রেন পাকিস্তানকে উপহার দেবে। কিন্তু বদমায়েশ জুগুগাত সিং-এর আত্মবিসর্জনের ফলে ট্রেনটি নির্বিঘ্নে পাকিস্তানের দিকে চলে যায়।

অন্যদিকে কৃষ্ণ চন্দর উর্দু ভাষায় রচিত ‘পেশোয়ার এক্সপ্রেস’ প্রকরণগত দিক থেকে ছোটগল্প। গল্পটি কৃষ্ণ চন্দর ‘হ্যাম ওয়াহসি হ্যায়’ (আমরা বর্বর) নামক উর্দু গল্পসংকলন গ্রন্থের অন্তর্গত। সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালে লখনৌ থেকে। প্রথম প্রকাশের সময় সংকলনটিতে ছয়টি গল্প ছিল, যথা— ‘পেশোয়ার এক্সপ্রেস’, ঠাণ্ডা গোসত, প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক পতিতার চিঠি, অন্ধত্বা, অমৃতসর, লালবাগ। সংকলনটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন জাফর আলম। মূল ‘হ্যাম ওয়াহসি হ্যায়’ গল্পসংকলন গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য গল্প ‘পেশোয়ার এক্সপ্রেস’ এবং ঐ গল্পটির নামানুসারে অনুবাদক জাফর আলম তিনি তাঁর অনূদিত গল্পসংকলনটির নামকরণ করেন ‘পেশোয়ার এক্সপ্রেস’ এবং তাঁর অনূদিত গল্পসংকলনটি বাংলাদেশ থেকে ২০১০ সালে প্রকাশিত হয়।

আমাদের মনে হয় দেশভাগের পর গণহত্যার সবচেয়ে নির্মম ও মর্মান্তিক চিত্র ভেসে উঠেছে ‘পেশোয়ার এক্সপ্রেস’ গল্পটিতে। সেখানে দেখা যায় পেশোয়ার এক্সপ্রেস নামক রেলগাড়িটি নিজেই উত্তম পুরুষ কথনরীতিতে আত্মকথা বলে চলেছে। মর্দান, কোহাট, চরসন্দা, খাইবার, লাভিকোটাল, নওশেরা, মানশেরা প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দু বাসিন্দাগণ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে শরণার্থী হয়ে পেশোয়ার শহর থেকে পেশোয়ার এক্সপ্রেসে উঠে পড়ে। পাকিস্তানে তাদের জানমালের নিরাপত্তা নেই, তাই তারা পাড়ি দেয় ভারতবর্ষে। পেশোয়ার থেকে পাড়ি দিয়ে ট্রেনটি হাসান আবদাল, তক্ষশীলা, রাওয়ালপিন্ডি, লালামুসা, ওয়াজিরাবাদ প্রভৃতি স্টেশনে শরণার্থীদের জন্য দাঁড়ায়। সাতপুরুষের ভিটেমাটি ত্যাগ করে পলায়মান যাত্রীদের চোখে মুখে ভয়। প্রতিটি মুহূর্তে তারা গুলির শব্দে মূর্ছিত হয় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একসময় দেখা যায় তক্ষশীলা স্টেশনে দু’শো হিন্দু মৃতদেহ এনে বালুচ সেনাদের হাতে তুলে দেয় প্রতিবেশী মুসলমানরা এবং তারা বালুচ সেনাদের কাছে দাবি জানায় যেন হিন্দু মৃতদেহগুলি যথাযথ মর্যাদা দিয়ে ভারতে পৌঁছে দেওয়া হয়। আবার ট্রেনটি চলতে থাকলে তার চেন টেনে তাকে থামানো হয় এবং বালুচ সেনারা যাত্রীদের ট্রেন থেকে নামিয়ে দিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করায় এবং গুলি করে হত্যা করে। সমস্ত প্লাটফর্ম রক্তের স্রোতে পিচ্ছিল হয়ে পড়ে। বগির ভিতর রক্ত ও পচা লাশের দুর্গন্ধে টেকা মুশকিল হলে বালুচ সেনারা কয়েকজনকে ডেকে লাশগুলি বাইরে ফেলার আদেশ দেয় এবং শেষে তাদেরকেও ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দেয়। এইভাবে ট্রেনটি ভীতসন্ত্রস্ত জীবন্ত মানুষ ও মৃত মানুষ উভয়কে নিয়ে লালামুসা থেকে ওয়াজিরাবাদে পৌঁছায়।

কিন্তু ট্রেনটি যখন লাহোরে পৌঁছায় তখন এক ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। সেখানে দু’নম্বর প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল অমৃতসর থেকে ছেড়ে আসা পাকিস্তানমুখী একটা ট্রেন। ট্রেনটি পূর্ব পাঞ্জাব থেকে মুসলমান মুহাজিরদের নিয়ে এসেছিল। কিন্তু জানা যায় ট্রেনটিকে থামিয়ে চারশো মুহাজিরকে খুন করা হয় এবং জনা পঞ্চাশ মুসলমান রমণীকে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তাই ঐ ঘটনার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কয়েকজন পাকিস্তানি স্বেচ্ছাসেবী পেশোয়ার এক্সপ্রেসে উঠে পড়ে হিন্দু রমণীসহ চারশো যাত্রীকে নামিয়ে নিয়ে যায়। এরপর দেখা যায় পেশোয়ার এক্সপ্রেস মোগলপুরায় পৌঁছায় এবং সেখানে সেনা বদল হয়। অর্থাৎ বালুচ সেনাদের জায়গায় উঠে পড়ে শিখ ও ডোগরা সেনাদল। পেশোয়ার এক্সপ্রেস যখন অমৃতসরে পৌঁছাল তখন শিখরা স্লোগানধ্বনি দিতে থাকল। আর হিন্দু, শিখ, রাজপুত, ডোগরা সেনারা বগিতে বগিতে উঁকি দিয়ে যেন শিকার খোঁজে বেড়ায় এবং স্টেশনের চারিদিকে মুসলমানদের লাশ পড়ে থাকে।

উপন্যাস ও ছোটগল্পটির পাতায় পাতায় গণহত্যার যে লাল রক্ত দেখা যায় তাতে আমরা শিহরিত হই, বেদনার্ত হই। মানবিক বিপর্যয়ের এই ন্যাকারজনক অধ্যায়টি আমাদের চেতনায় বারবার কশাঘাত করে। তাই বারবার ফিরে যেতে হয় দেশ ও জাতির অতীত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের দিকে। সেখানে দেখা যায় ভারতবর্ষের মানচিত্রের পরিসর যেমন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বৃহত্তম তেমনি সেই মানচিত্রের অধিবাসীরাও বহুবৈচিত্র সম্পন্ন ছিল। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা তাকে আরো বৈচিত্র প্রদান করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদ, শস্য উৎপাদনের প্রাচুর্য, শিল্প-বাণিজ্যের উন্নত কেন্দ্রস্থল তার অর্থনৈতিক পরিবেশকে সমৃদ্ধ-ঋদ্ধ করেছে। একদিকে বসবাসের মনোরম আবহাওয়া অন্যদিকে অর্থ-সম্পদের ভাণ্ডার তাকে পৃথিবীর বুকে ঈর্ষণীয় করে তুলেছিল। ফলে লোভের বশবর্তী হয়ে হানাদাররা বারবার ভারতবর্ষের বুকে তীক্ষ্ণ নখের থাবা বসিয়েছে। তারা ধ্বংস করেছে, লুণ্ঠন করেছে, রাজত্ব করেছে। তবে একথা ইতিহাস সিদ্ধ যে ইংরেজ জাতির পূর্বে যে সমস্ত বিদেশী-বিজাতি হানাদার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল তারা ভারতীয়দের সঙ্গে মিশে গিয়ে ভারতীয় হয়ে ভারতবর্ষে বসবাস করতে শুরু করে। তবে একথাও সত্য যে তাদের মধ্যেও জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ ছিল।

তবে জাতি ও ধর্মগত দিক থেকে আধুনিক অঞ্চল ভারতবর্ষ হিন্দু ও মুসলমান জাতি প্রধান দেশে পরিণত হয়। যদিও বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পারসিক, প্রভৃতি ধর্ম ও জনজাতির মানুষের বসবাসও পাশাপাশি ছিল। প্রাচীন ভারতবর্ষেও কমবেশি ঐ ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষরাই বসবাস করত। তবে তাদের মধ্যে কোনো ধর্মীয় সংঘাত ছিল না— এ কথা একেবারে নিশ্চিত হয়ে বলা যায় না। এক ধর্ম ও জাতির সঙ্গে অন্য ধর্ম ও জাতির মতাদর্শগত প্রভেদ ছিল এবং সেটা থাকা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আর সেই প্রভেদ ছিল মূলত এক ধর্ম-সম্প্রদায়ের থেকে অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি, আচার-সংস্কার, ন্যায়-নৈতিকতা, সহিষ্ণুতা-গ্রহিষ্ণুতা, বিশ্বাস-আশ্বাসগত দিকগুলি কতটা উন্নত ও অনন্য সেটা প্রদর্শন করা। ফলে এক ধর্ম-সম্প্রদায় অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়কে পরাহত করেছে, কিন্তু বল প্রয়োগ করে ধর্মীয় বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেনি। ফলত, পরাজিত জাতিটি দেশের অন্য স্থানে সরে পড়েছে কিংবা স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করে ভিন্ন ধর্মের রাজশাসনে স্বধর্ম পালন করেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমনের পর এই চিত্রটি সম্পূর্ণ বদলে যায়। কারণ তারা ভারতবাসীকে আপন ভাবেই পারেনি, প্রকারান্তরে তারা ভারতবাসীকে বর্বর, আদিম, অসভ্য, অশিক্ষিত জাতি বলে ঘৃণা করত। ভারতবাসীও সেটা বুঝতে পেরেছিল। ফলে ভারতবাসীর চেতনায় নতুন করে ভ্রাতৃত্ববোধ, স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। তাই ভারতবাসী সকল প্রকার জাতি ও ধর্মগত বিরোধ-বিদ্বেষ জলাঞ্জলি দিয়ে ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় আন্দোলনে शामिल হয়েছিল।

তবে ভারতবর্ষে ইংরেজরা শাসন পরিচালনা করত প্রধানত বাইবেল ও রাইফেল— এই দুই অস্ত্রের দ্বারা। যারা বাইবেলের বশ্যতা স্বীকার করতে চায়নি তাদেরকে রাইফেলের মুখে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছে। কিন্তু শাসন-শোষণে ভারাক্রান্ত ভারতবাসীর চেতনায় যেদিন থেকে আত্মজাগরণের বোধ সঞ্চারিত হয়েছিল সেদিন থেকেই তারা জাত ও ধর্মের কথা ভুলে গিয়েছিল। সেদিন থেকেই তারা একে অপরের জন্য, দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং দেশ ও জাতির জন্য স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। কিন্তু হঠাৎ কোনো এক অদৃশ্য যাদুকাঠির স্পর্শে ভারতবাসীর সমস্ত শুভচেতনা ও মানবিকতার পট পরিবর্তন ঘটে যায়। মঙ্গলময়তা ও কল্যাণের জন্য জীবনের বলিদান ও কৃচ্ছসাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মৌলবাদীদের সাম্প্রদায়িক উসকানিতে গৃহদাঙ্গা বাঁধে। ফলে ধর্মীয় প্ররোচনায় চালিত গণহত্যার রক্ততে পথ কর্দমাক্ত হয়ে ওঠে। মানবতা অমানুষিক দানবতায় পরিণত হয়। এই হত্যা ও মানবতার অধঃপতন দেখে গল্পকার কৃষ্ণ চন্দর বলেছেন—

“আরও তিরিশ জন মারা গেল। এখানে রাজত্ব করতেন কনিষ্ক। তাঁর রাজত্বে প্রজাদের ছিল শান্তি, সমৃদ্ধি আর ভ্রাতৃত্ববোধ।

তারা আরও কুড়িজনকে মেরে ফেলল। এই গ্রামগুলোতেই একদিন বুদ্ধের মহান সংগীতের গুঞ্জন শোনা যেত। ভিক্ষুরা এখানে বসেই রচনা করেছিল প্রেম, সত্য আর সৌন্দর্যের বাণী। দেখেছিল নতুন ধরনের জীবনযাপনের স্বপ্ন।”^৩

ঐক্যবদ্ধ একটি জাতির মানবতার অবনমনের পশ্চাতে কুখ্যাত মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা এক ও অদ্বিতীয় ভাবে কার্যকর ছিল। কারণ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হবার সঙ্গে সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ একটি জাতির প্রাণে ফাটল ধরে। ফলে ধর্মীয় মানদণ্ডে মানুষ হয়ে ওঠে ভারতীয় ও পাকিস্তানি নামে দুই বিপরীত জাতিসত্তা ও আদর্শের মানুষ। ফলে ভ্রাতৃত্ব বদলে যায় শত্রুতায়। মাথা চাঁড়া দিতে থাকে ধর্মীয় সংঘাতের। পারস্পরিক হানাহানি ও কাড়াকাড়িতে মানুষ মত্ত হয়ে ওঠে। একে অপরের জমিজমেরেত, বাস্তুভিটে আত্মসাৎ করার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। শিশু, আবালা, বৃদ্ধ খুন ও জখম হয়। সতীত্ব হারায় হাজার হাজার নারী। তাই সেদিনের মানুষের মনুষ্যত্বের অধঃপতন ও অবনমনের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছেন—

“When partition actually took place, rivers of blood flowed in the large parts of the country. Innocent men, women and children were massacred. The Indian Army was divided and nothing effective was done to stop the murder of innocent Hindus and Muslims.”⁸

আর এই ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার নির্মম চিত্র আমরা ‘ট্রেন টু পাকিস্তান’ ও ‘পেশোয়ার এক্সপ্রেস’ নামাঙ্কিত উপন্যাস ও ছোটগল্পটির ক্যানভাসে দেখতে পাই।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হয় ভারতের স্বাধীনতা আইন। অর্থাৎ একটা দেশের সার্বভৌমিকতা নির্ধারণ করে দেয় অন্য একটি দেশ; যারা ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিগত দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটা জাতি। তাছাড়া যে জাতি প্রায় দু’শো বছরের অধিক সময় ধরে ভারতীয়দের পদদলিত করেছে, শাসন ও শোষণ করেছে এবং বর্বর ও আদিম বলে ঘৃণা করেছে তাদের কাছে সুবিচার আশা করা যায় না। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ জাতি শুধুমাত্র লোভী ও হিংস্রই ছিল না— তারা একই সঙ্গে কূটনীতিবাদী ও প্রতারকও ছিল। সেজন্য তারা বারবার ভারতীয়দের মধ্যে জাতি ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় আন্দোলনকে দমন করেছে। এমনকি ভারতকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে— এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে তারা ভারত থেকে সেনা ও অর্থ সংগ্রহ করেছে। আবার ভারতবাসীও স্বায়ত্তশাসনের আশায় অকৃপণভাবে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষে তারা ভারতীয়দের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এতৎসত্ত্বেও তৎকালীন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গ ইংরেজদের প্ররোচনায় পা দেয় এবং স্বাধীনতার নামে ব্রিটিশদের চক্রান্ত মেনে নেয়। ফলে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা ভারতবর্ষের মাটিতে বসে বহুদিন ধরে ভারত বিভাগের যে পরিকল্পনার ছক কষে আসছিল তা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বসে বাস্তবায়িত করে ফেলে। আর সেই পরিকল্পনা মোতাবেক স্যার সিরিল র্যাডক্লিফ কাগজের মানচিত্রের উপর মোটা দাগ মারে। ফলে কাগজে অঙ্কিত সেই দাগের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয় পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশের মানুষ। কারণ পাঞ্জাবের পশ্চিমভাগ ও বঙ্গদেশের পূর্বভাগ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই সময় খণ্ডিত অংশের মানুষের জীবন ও সংসারের কথা কেউ ভাবেনি। ফলস্বরূপ, পাঞ্জাবের হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ উন্মূল হয়ে পড়ে।

তৎকালীন পাঞ্জাবের জনবিন্যাস ও জনবসতি এমনই বৈচিত্র্যময় ছিল যে তাকে কোনো রেখার দ্বারা হিন্দু, মুসলমান ও শিখ প্রধান অঞ্চলে আলাদা করে ভাগ করা সম্ভব ছিল না। উপরন্তু জোর করে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের ফলে পুরো পাঞ্জাব প্রদেশের মানুষ প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হয়। হাজার হাজার মানুষ বাস্তুহারা হয় এবং জমিজমেরেত হারিয়ে দেশান্তরিত হতে বাধ্য হয়। তবে শুধু একটি বা দুটি সম্প্রদায় নয়, পাঞ্জাবের হিন্দু, মুসলমান ও শিখ— এই তিন সম্প্রদায়ের মানুষই ঐ নোংরা কূটনীতি ও চক্রান্তের শিকার হয়। ফলে সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্বের সুবিধা ভোগ ও প্রশাসনিক আধিকারীদের বিলাসব্যবসনের ফলে যে অচলাবস্থার পরিবেশ-পরিষ্কৃতি তৈরি হয়েছিল তারই ফলশ্রুতিতে সেদিনের মানুষ রক্তের হোলি উৎসবে মেতে উঠেছিল। তাই দেশ ও মানুষের হিতাকাজক্ষী যুবক ইকবালকে সম্মুখে রেখে ঔপন্যাসিক বলেছেন—

“ভারতের মতো বিশাল দেশে এবং অগণিত মানুষের মাঝে তাঁর মতো ক্ষুদ্র এক ব্যক্তি কতটুকুই বা করতে পারেন? তিনি কি হত্যা বন্ধ করতে পারেন? হিন্দু, মুসলমান, শিখ, কংগ্রেস কর্মী, লীগ কর্মী,

আকালী বা কমিউনিস্ট দল— সবাই এ কাজে জড়িত। বুর্জোয়া বিপ্লব প্রোলেতারিয়েত বিপ্লবে রূপান্তরিত হবে এমন কথা বলা আত্মতুষ্টিরই নামান্তর। ঐ অবস্থা এখনও আসেনি। হিন্দুস্তান বা পাকিস্তানের সাধারণ লোক এখনও রাজনৈতিক স্বাধীনতার ব্যাপারে উদাসীন। ভিন্নধর্মী লোককে খুন করে তার জমি আত্মসাৎ করাকে তারা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা মনে করে।”^৫

ঔপন্যাসিক খুশবন্ত সিং এবং কৃষ্ণ চন্দর ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ঝগড়াবিষ্ফুরক সময়ের মানুষ ও শিল্পী। তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রাম, যুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, মহামারি এবং দেশ ও মানুষের ভাঙা-গড়ার সবকিছু প্রত্যক্ষ করেছেন। মাতৃভূমি ও বাস্তুভিটের জন্য রুধির স্রোতধারা বয়ে যেতে দেখেছেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতবিক্ষত ও বেদনার্ত হয়েছেন ন্যায়পরায়ণ মানুষের অভাব দেখে, মানবিকতার অভাব দেখে, বিবেকের অপমৃত্যু দেখে। ‘খুনকা বদলা খুন’ করার মনোবৃত্তি যখন মানুষের রক্তে রক্তে প্রবাহিত হয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে, ট্রেন ভর্তি লাশ যখন পাকিস্তানে পাঠাবার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়ে গেছে তখন ঔপন্যাসিক সন্ধান করে বেড়িয়েছেন একজন সত্যকার মানবহিতৈষী মানুষের। আর সেই মানুষের সন্ধান না পেয়ে তিনি বদমায়েশ জুগগাত সিংকে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় উপস্থাপন করেছেন। সেজন্য দেখা যায় বদমায়েশ জুগগাত সিং নিজের প্রাণের বিনিময়ে নিরপরাধ মুসলমান শিশু, বৃদ্ধ, মহিলা মুহাজির ভর্তি ট্রেনটিকে নির্বিঘ্নে পাকিস্তানে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। আমাদের মনে হয় ঔপন্যাসিক খুশবন্ত সিং সজ্ঞানে বদমায়েশ জুগগাত সিংকে দিয়ে একজন বিবেকবান-মানবদরদি মানুষের কাজটি করিয়েছেন, যাতে মানুষের বিবেকে কশাঘাত পড়ে।

অন্যদিকে গল্পকার কৃষ্ণ চন্দরও হত্যা প্রতি হত্যার দৃশ্য দেখে বিবেকজ্বালায় জর্জরিত হয়েছেন। মানুষের মানবিক গুণাবলীর অবক্ষয়ে তিনি শঙ্কিত হয়েছেন। একদা ভারতবর্ষ ছিল শিক্ষা ও সংস্কৃতির পীঠস্থান। এখানকার শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য সারা পৃথিবীতে আলোর দিশা দেখিয়েছিল। বিদেশী পর্যটকরা জ্ঞানান্বেষণের জন্য এদেশে এসেছে। এদেশের মানুষও শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতায় ছিল অগ্রগণ্য। এখানকার রাজার রাজত্বে প্রজাদের মধ্যে শান্তি, সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল। আর সেই সভ্যতার অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করে আশঙ্কিত গল্পকার বলেছেন—

“এই তক্ষশীলায় ছিল এশিয়ার সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে লাখ লাখ ছাত্র মানবসভ্যতা বিষয়ে তাদের প্রথম পাঠ নিয়েছিল। ...তক্ষশীলার জাদুঘরে ছিল সুন্দর সুন্দর মূর্তি। অলংকারের অতুলনীয় কারুকৃতি, দুর্লভ শিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শন, আমাদের সভ্যতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল দীপশিখার মতো।”^৬

অথচ এই তক্ষশীলা স্টেশনে বালুচ সেনার গুলিতে শত শত শরণার্থী মুখ থুবড়ে পড়ে জীবন হারায়, চারিদিকে পড়ে থাকে গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ ও উজ্জ্বল স্মৃতির চিহ্ন। শান্তি-সম্প্রীতির তক্ষশীলা শ্মশানে পরিণত হয়। ফলে তক্ষশীলার অতীত গৌরব ম্লান হয়ে যায়। তাই গল্পকার ধ্বংসোল্লাসে মত্ত মানুষের আত্মগৌরবকে স্মরণ করিয়ে বিবেকবোধ জাগ্রত করতে চেয়েছেন। সেজন্য গল্পের শেষে তিনি বলেছেন—

“আমি সামান্য কাঠের তৈরি একটা প্রাণহীন ট্রেন। কেউ প্রতিশোধ ও ঘৃণার এমন জঘন্য ভারী বোঝা আমার পিঠে চাপিয়ে দিক, আমি তা চাই না। দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে আমাকে দিয়ে খাদ্য বহন করানো হোক, আমাকে দিয়ে গ্রামের চাষীদের জন্য ট্রাক্টর আর সার বহন করে নিয়ে যাওয়া হোক। আমাকে যেখানেই নিয়ে যাওয়া হোক না কেন মৃত্যু ও ধ্বংসের মধ্যে যেন না নেওয়া হয়।

আমি চাই, আমার গাড়ির প্রতিটি বগিতে সুখী চাষি ও শ্রমিকের দল এবং তাদের স্ত্রীদের কোলে থাকবে পদ্মফুলের মতো সুন্দর সব শিশু। ওরা মৃত্যুকে নয়, বরং আগামী দিনের জীবনকে মাথা নত করে কুর্নিশ করবে। এই সব শিশুই এক নতুন জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলবে, যেখানে মানুষ হিন্দু ও মুসলমান হিসেবে পরিচিত হবে না, শুধু পরিচিত হবে একমাত্র মানুষ হিসেবে।”^৭

মুহাজির ও শরণার্থীদের গণহত্যার বিতীর্ষিকা পেরিয়ে অবশেষে বলতেই হয় ১৯৪৭ ভারত ইতিহাসের একই সঙ্গে কাঙ্ক্ষিত ও যন্ত্রণার সময়। কারণ সময়টি একপ্রকার যন্ত্রণা ও রাহুগ্ধ অন্ধকার থেকে মানুষকে মুক্তি প্রদান করে আরেক যন্ত্রণা ও অভিশাপে দেশবাসীকে বিদ্ধ করে। যার সাময়িক প্রতিচ্ছবি ছিল অতিব ভয়ংকর এবং করুণ। আজও তার পরিণাম আমাদের অনুভূতিতে বেদনার উদ্বেক ঘটায়, বিবেক ও চেতনায় কুঠারাঘাত মারে। কেননা আমাদের প্রপিতামহ-পিতামহ

সেই নিষ্পেষণের আওনে দগ্ধ হয়েছিল। আমরা তাদের উত্তরসূরী। ফলে শিল্প ও সাহিত্যের পাতায় ভর করে থাকা ঘণ্য রাজনীতির বলি ঐ আওনেদগ্ধ মানুষগুলির জীবাশ্ম আমাদের বিবেকদংশন ঘটায়। তাই কীভাবে সেই আওন প্রজ্বলিত হয়েছিল আমরা তার উৎস অনুসন্ধান করে বেড়ায়। তাতে ব্যথা ও বেদনার কোনো প্রকার উপশম হয় না। শুধু সেই সময় ও ইতিহাসের রক্তাক্ত অধ্যায়টি একরাশ হতাশার প্রশ্ন নিয়ে আমাদের বিবেক ও চেতনার পোর্টফলিওতে জমা থাকে।

Reference:

১. সিং, খুশবন্ত, 'ট্রেন টু পাকিস্তান' (অনুবাদক-আবু জাফর), ঢাকা (বাংলাদেশ), দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, দশম মুদ্রণ-জুন ২০২২, পৃ. ১৬৩
২. ঐ, পৃ. ১৩৮
৩. চন্দর, কৃষ্ণ, 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস' (অনুবাদক-জাফর আলম), ঢাকা (বাংলাদেশ), প্রথমা প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ - জুন ২০১১, পৃ. ৫৬
৪. Maulana, Abul Kalam Azad. 'The Mountbatten Mission', India Wins Freedom. New Delhi, Sani H. Panhwar, Reproduced-2017. P. 162
৫. সিং, খুশবন্ত, 'ট্রেন টু পাকিস্তান' (অনুবাদক-আবু জাফর), ঢাকা (বাংলাদেশ), দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, দশম মুদ্রণ-জুন ২০২২, পৃ. ৪৭
৬. চন্দর, কৃষ্ণ, 'পেশোয়ার এক্সপ্রেস' (অনুবাদক-জাফর আলম), ঢাকা (বাংলাদেশ), প্রথমা প্রকাশন, দ্বিতীয় মুদ্রণ-জুন ২০১১, পৃ. ৫৬
৭. ঐ, পৃ. ৬৩